বিষমানুষের গল্প

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

এই নামটা — বিষমানুষের গল্প, বেশ বিসদৃশ শুনতে, আর দেখতে তো বিষ-দৃশ বটেই — আদতে একটা ইংরিজি নামের অনুবাদ। দি স্টোরি অফ পয়জন পিপল। গল্প-র উপাদান অনেক আছে, কিন্তু, স্টোরি নয়, একটা রিপোর্ট, একটা ঘোষণা। যে রিপোর্টটা হয়ত ইংরিজিতে বেরোলেই ভাল হত, আরো অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারত।

বহু বছর ধরে এই লেখাটা, লেখার প্ল্যানটা, ত্রিদিবের মাথায় রয়েছে। তার মূল কারণ একটা দূরদৃষ্টি, আর দূরদৃষ্টিটা আছে বলেই একটা দায়িত্ব তথা অপরাধবোধ। দূরদৃষ্টি তাই যা দিয়ে ত্রিদিব জেনেছিল — জানেনি ঠিক, বুঝেছিল বা আন্দাজ করেছিল গোটা ব্যাপারটা। আর, অপরাধবোধটা হল লোককে আগাম জানিয়ে সাবধান করে দিতে না-পারার। এক ভাবে দেখলে, এই পয়জন পিপলের ব্যাপারটা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে অনেকগুলো বছর ধরে। এটা হওয়ার কথাও। সে নিজেই একজন বিষমানুষ। এবং, ঠিক, এইডস অনাক্রান্ত এইচআইভি পজিটিভ বাহকের মত, এমন এক বিষমানুষ, যাকে দেখে, আপাতদৃষ্টিতে আন্দাজ করা সম্ভব না তার এই পরিচিতিটা। তাতে অবশ্য বিষমানুষ হিশেবে বিপজ্জনকতাটা বরং বাড়ে বই কমে না। কার কাছে বাড়ে, সেটা অবশ্যই একটা প্রশ্ন। অবশ্যই বিষমানুষের কাছে নয়। অন্যদের কাছে, যারা বিষমানুষ নয়, এই রিপোর্টে তাদের আমরা উল্লেখ করব বিষমানুষের বিপরীতে অমৃতমানুষ বলে। তারা কেউই অমৃত বা অমর নয়, কিন্তু এই রিপোর্টের গোড়ার জায়গাটা বিষমানুষ বা বিষমানুষতা, তাদের নিরিখেই গোটাটাকে বুঝছি আমরা, এটা ওই নামে চিহ্নিত থাকবে।

বিষমানুষ দু-রকমের হয়। এক, ব্যক্ত বিষমানুষ, যাকে বহিরাঙ্গিক অবয়ব থেকেই বুঝে ফেলা যায়। আর দুই, অব্যক্ত, যার বিষমানুষত্ব চেনা বা বোঝা যায় শুধু তার ইতিহাস থেকে। এবং সচরাচর এই বোঝাটা আসে একটা আবিষ্কার হয়ে — গোপন অবরুদ্ধ বিস্মৃত তথ্যের উপর একটা আলোকপাত। কখনো এই আবিষ্কার তার নিজেরই, সে নিজেই যখন নিজের ইতিহাসের পাঠক, বা, সঠিক অর্থে, এমন একজন প্রত্নতাত্ত্বিক যে নিজেকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখছে, কজন মানুষের আর লিপিবদ্ধ ব্যক্তি-ইতিহাস থাকে? আবার, কখনো, সে নিজে নয়, সেই ইতিহাস পড়ে অন্য কেউ। রাজীব আর ত্রিদিব এই দুজনের বেলাতেই যেমন, আবিষ্কারটা ছিল ত্রিদিবের। রাজীব অবশ্য সব বোধের বার, ও আর কী আবিষ্কারই বা করবে? ও তো এখনো জানেই না নিজের এই পরিচিতি, এই বিষমানুষ আইডেন্টিটিটা। বা হয়ত জানে। ত্রিদিব জানে না, রাজীব জানে কিনা। কে জানে, অন্য কেউ কী জানে?

তবে, একটা ব্যাপার দু-ধরনের বিষমানুষের বেলাতেই সত্যি — সেটা এই যে, চোখে দেখে বা বাইরে থেকে বোঝা যাক আর না-যাক, ব্যক্ত বিষমানুষই হোক, বা অব্যক্ত, পুরুষ হলে তার ঔরস বা নারী হলে তার গর্ভ থেকে জন্মানো নতুন জনিতৃর মধ্যে এই বিষাক্ততাটা রয়েই যাবে, প্রকাশ্যে বা গোপনে। কখনো সেটা প্রজননের পর প্রজনন, জেনারেশনের পর জেনারেশন জুড়েও অব্যক্ত থাকতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে অনস্তিত্ব হয়ে গেল। কোনো আকস্মিক অজ্ঞাতপূর্ব মুহূর্তে সেটা ব্যক্ত হয়ে উঠবে চালু প্রজনিতৃর শরীরে তথা বাস্তবতায়। ত্রিদিবদের বেলায় যা হয়েছিল। এটাই বিষমানুষত্বের বিভীষিকার দিক, সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক। নিখুঁত ভাবে কেউ বলতে পারে না, তার নিজের মধ্যে বিষমানুষতার বীজ আছে না নেই। নিজেদের পারিবারিক ইতিহাস খুঁড়ে দেখেছে ত্রিদিব, নিজেদের বংশলতিকায় অন্তত আগের পাঁচটা জেনারেশন বা জনিতৃ জুড়ে কোনো ব্যক্ত বিষমানুষ নেই। অবশ্য, কেউ থাকলেও, সেই তথ্য অবরুদ্ধ হয়ে থাকতেই পারে। এখন, এ নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে, ক্রমে যা দেখছে ত্রিদিব, গোটা ইতিহাস জুড়ে শুধু পয়জন পিপল-ই অবরুদ্ধ আক্রান্ত নিহত এবং অবশেষহীন ভাবে অবলুপ্ত হয়নি, হয়েছে তাদের তথ্যটুকুও। মানবসভ্যতার ইতিহাস মানে, এক অর্থে, বিষমানুষদের অস্বীকার করার, গোপন করার এবং নিশ্চিহ্ন করার ইতিহাস। সেই অর্থে, দি স্টোরি অফ পয়জন পিপল একটা আক্রান্ত জাতিসত্তার আভ্যন্তরীন দলিল।

রাজীবের কথাটা, উঠে পড়ল যখন, ওটা দিয়েই শুরু করা যাক। পয়জন পিপলের পুরো রিপোর্টটা ওই স্টোরি বা আখ্যানের বা গল্পের আকারে ত্রিদিব বারবার লেখার চেষ্টা করে এসেছে। বাংলায় এবং ইংরিজিতে । হার্ডডিস্কময় ছড়িয়ে রয়েছে বারংবার সেই অসম্পূর্ণ অসফল প্রয়াসের চিহ্নগুলো। তাদের বেশিরভাগেরই শুরু রাজীবকে দিয়ে।

কোনোটা কোনোটা ব্যাংক-দারোয়ানের সেই সঙ্গিনীকে দিয়েও। দু-একটার শুরুতে ত্রিদিবের একটা কাল্পনিক রোজনামচা। রোজনামচা ব্যাপারটা আর কিছুই না, লোককে গোড়াতেই বিষয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া, এই লেখায় চার প্যারার দীর্ঘ ভূমিকা যে কাজটা করল। অন্য দু-রকম শুরুই এসেছে লেখক ত্রিদিবের গল্প লেখার চেষ্টা থেকে।

কী করে লিখব, এটা ভাবার আগেই, যা দিয়ে বিষয়টা ত্রিদিবের নিজের মাথায় হাজির হয়, সেটা প্রতিবারই রাজীব। রাজীবের গোটা বাস্তবতাটা ত্রিদিবকে এক অর্থে তাড়িয়ে বেড়ায়। রাজীবের গোটা বেঁচে থাকাটাই এমন এক অসম্ভাব্যতা, একটা ইমপসিবিলিটি, যে, নিজের কোনো গল্পের চরিত্র বা ঘটনাধারা হিশেবে কখনোই রাজীবকে বানিয়ে তুলত না ত্রিদিব। এরকম একটা উদ্ভট কিমাকার কিছু বানাতে গেলেই লেখক হিশেবে রিয়ালিজমের একটা দায় এসে যায়। একটা প্রশ্ন এসে যায় : কেন? কেন এরকম অসম্ভাব্য কিছু বানাতে চাইছে? গল্পের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার একটা দায় থেকেই যায় গল্পকারের। প্রশ্নটা করার সময় পাঠকের মনে থাকে না, গল্পকার আসলে গল্পকারের নিজের চেয়ে অনেক বৃহত্তর একটা বাস্তবতা দিয়ে নির্মিত নির্ণীত তাড়িত, আর, সেই বাস্তবতাটাকে নির্মিত এবং তাড়িত গল্পকার ত্রিদিবের কাছে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব কারুর নেই। গল্পকার সেখানে আওয়ারা দিওয়ানা বেত্রাহত, ৯৭% আর্দ্রতা এবং ৪২ ° সেন্টিগ্রেডের দুপুরে কোনো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে মহাপ্রস্থানের পদযাত্রী কুকুরের মত।

সত্যিই রাজীবের গলার আওয়াজটা তাড়িয়ে বেড়ায় ত্রিদিবকে। একটা গোঙানি। গোঙানি কাকে বলে? মানুষ যন্ত্রণা পেলে গোঙায় — এটা দেখতে দেখতে আমরা এতটাই অভ্যস্ত, গোঙানি শব্দটা শুনলেই তার পিছনে একটা যন্ত্রণা খুঁজি। রাজীবের কি যন্ত্রণা হয় আদৌ? ওটা কি যন্ত্রণার আওয়াজ — কী আওয়াজ ওটা? রাজীব কি কিছু বলে? কী বলে? কখনো কখনো একটানা দু-দিন আড়াইদিন চলে আওয়াজটা, নিরবচ্ছিন্ন, ছেদহীন, বিরতিহীন। আওয়াজটা চলাকালীন রাজীবকে খাইয়ে দেখেছে, পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেখেছে, জামা পাল্টে, মাথার বালিশ সরিয়ে, আলো নিভিয়ে, আলো জ্বেলে, সব কিছু, কিছুতেই থামে না। কোনো একটা যন্ত্রণা বা খারাপ-লাগা ছিল নিশ্চয়ই, খুঁজে পাওয়া যায়নি। পেলে, সেই মুহূর্তেই হয়ত থেমে যেত রাজীব। কিন্তু থামে না। চলতেই থাকে, চলতেই থাকে, এতটাই ছেদহীন, এতটাই পরিব্যাপ্ত যে, এক এক সময় মনে হয়, আওয়াজটা আর হচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছে না, থেমে গেছে। আবার টের পাওয়া যায়, আওয়াজটা থামলেই। কী অদ্ভুত শূন্য লাগে তখন। শান্ত, বর্ণহীন এবং মৃত লাগে ত্রিদিবের। বছরের পর বছর আওয়াজটার সঙ্গে থাকতে থাকতে আওয়াজটা তার শরীরের মেরুদণ্ডের আত্মার মধ্যে ঢুকে গেছে। মাঝে মাঝে খুব ভয় করে ত্রিদিবের, আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেলেই। এই বিভীষিকারই ছায়া ছিল দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয়তে ত্রিদিবের ওই গল্পটায়, খুব নাম হয়েছিল গল্পটার, 'হৃদয় ও হৃদপিণ্ড'। তার নায়কের নামও ত্রিদিব। ত্রিদিব এটা ইচ্ছে করেই করে। লেখক আর নায়কের নাম একই হওয়ায়, একটা বাড়তি বিশ্বস্ততার, অথেনটিসিটির চাপ চারিয়ে যায় পাঠকের উপর। গল্পের মূল বিন্দুটা হল একটা আবিষ্কারের নাটকীয়তা। সবাই জানে, উপচার বা পেটিং বা যৌন-আদরের সময় হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায়। গল্পের নায়ক ত্রিদিব, একদিন তার প্রেমিকাকে আদর করা-কালীন, চুমু খেতে খেতে, লক্ষ্য করল, তার নিজের হৃদপিণ্ড আর চলছে না। গল্পটা খুব পড়েছিল মানুষ, জনপ্রিয় হয়েছিল, টেলে-প্লের কথাও চলছে, তাই, এর শেষটা মোটামুটি সবারই জানা। বিষয়টা এই যে, রাজীবের গোঙানিটা ত্রিদিবের হৃদস্পন্দনের মত হয়ে গেছে, সেটা হঠাত্ একদিন আর খুঁজে না-পাওয়ার আতঙ্কটাই এই গল্পের পিছনের গল্প।

বছরের পর বছর ত্রিদিব বেঁচে রয়েছে আওয়াজটার সঙ্গে। একসময় সে আর রাজীব থাকত এক ঘরে, পাশাপাশি দুটো এক-সাইজের বিছানায়। ত্রিদিবের জন্যে একটা টেবিল ছিল, রাজীবের তো ওসব লাগত না। শুধু খাট-বিছানা না, ত্রিদিব রাজীবের জামাকাপড়ও হত একই সাইজের। রাজীবের ইচ্ছেয় রাজীবের শরীরে কখনো একটা পেশিও নড়েনি, কিন্তু তাই বলে বৃদ্ধি আটকে থাকেনি। হুবহু একই ভাবে বেড়েছে রাজীবের শরীর, যেমন ত্রিদিবের বেড়েছে। সেরকমই হওয়ার কথা, ওরা যমজ। আসলে যমজ না, ওরা হল চতুর্জ বা কোয়ার্টেট। চারজনের মধ্যে শুধু ত্রিদিব আর রাজীবেরই নামকরণ হয়েছিল, অন্য দুই ভাইয়ের নাম দেওয়ারও প্রয়োজন পড়েনি, ওরা মারা গেছিল প্রসবদ্বার থেকে নির্গমনের কয়েক সেকেন্ড আগে এবং পরে। ছোটবেলায় মৃত্যুটা ভাল বুঝত না ত্রিদিব, এখনো কি বোঝে ঠিক, ভাই দুটোকে খুঁজত। মনে হত, রাজীব না, ওরাই তার ভাল ভাই। রাজীবকে পছন্দ ছিল না ত্রিদিবের। এটা একটা কী ভাই, কিছুই করে না, অন্যদের ভাইরা একদম আলাদা।

যমজ ব্যাপারটাই কম হয়, আর চতুর্জ তো শোনাই যায় না। আবার চারটে বাচ্চাই পুরুষ বাচ্চা। তার উপর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটো বাচ্চা মরে গেল। যারা রইল, তাদের একটা নড়ে না, মুখ নাড়ে না, এদিকে বেঁচে আছে। বিস্ময় বা ওয়ান্ডার- উপাদান এত অজস্র যে এই নিয়ে জনশ্রুতি বা রূপকথার কোনো অভাব পড়েনি কখনো। আর এই গোটাটা মিলে ত্রিদিবকে আজীবন এমন অপ্রতিরোধ্য একটা ফোকাসে রেখেছে যা নিজেই একটা রূপকথা। কিন্তু, রূপকথা শোনা আর রূপকথা বাঁচা এ- দুটো বড্ড আলাদা। কোনো যুগান্তকারী কীর্তি ছাড়াই, চিরকাল, ত্রিদিবের পরিচিতি ত্রিদিবের থেকে কয়েক টাইমফ্রেম এগিয়ে থেকেছে — সবসময়েই ত্রিদিব বেঁচেছে আগে থেকে শেষ জেনে যাওয়া একটা ডিটেকটিভ ছোটগল্পের মত, না, আরো খারাপ, আগে থেকেই হেসে ফেলা একটা রসিকতার মত।

দুই মৃত, এক অনড়, আর সে নিজে, এই চার ভাইয়ের জন্ম বা মৃত্যু নিয়ে যা যা গল্প শুনেছে ত্রিদিব, তার মধ্যে প্রচুর গল্প, স্বাভাবিক ভাবেই, গল্প হিশেবে অত্যন্ত খাজা। নিজের মনে নিজেকে মাঝে মাঝে এই রসিকতাটা শোনায় ত্রিদিব, সে অন্তত এর চেয়ে ঢের ভাল লেখে। বানাবি তো একটু ভাল বানা। প্রচুর গল্পে এমনকি কাঠামোগত কার্যকারণের শৃঙ্খলাটুকু অব্দি নেই। অনেক গল্পে শুরু আর শেষের পরম্পরাটুকুও রক্ষিত নেই। বাস্তবতা তথা যুক্তিবোধ এসব তো মানেই-নি। কোনো কোনো গল্প একটু-আধটু মজা তৈরি করে উঠতে পেরেছে, আবার কিছু গল্প বেদনাও দিয়েছে। কিছু অমূলক অর্থহীন নির্বোধ গল্প ।

যেমন একটা গল্প মা-র বাঁ- হাতের বুড়ো আঙুলে গজিয়ে ওঠা একটা চারমুখওলা আঁচিল নিয়ে। সেই আঁচিল অপারেশন করাতেই নাকি বিপত্তি, কারণ, মেয়েদের বাঁ বুড়ো আঙুল তাদের সন্তানস্থান। মজার কথা, এই গল্পটার একটা চিহ্ন ত্রিদিব মিলিয়েও নিতে পেরেছে। মার মৃতদেহের ছবিতে খুব সুন্দর স্পষ্টতায় এসেছে পেতে রাখা হাত-দুটো, ছবিটাকে ১২০০ ডিপিআই-এ স্ক্যান করানো মাত্রই নিখুঁত ফুটে উঠল একটা ছোট্ট দাগ, যা অপারেশনের দাগ হতে বাধ্য। আর বুড়ো আঙুলের ওই জায়গায় আঁচিলের চিহ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এ ধরনের লোকশ্রুতি গল্পের একটা অর্ধসত্য প্রায়সত্য শিকড় প্রায়ই থাকে। তবে, শেষ অব্দি যা দাঁড়ায় তা মিথ্যের চেয়েও খারাপ। গল্পটা যেহেতু তাদের দুর্ভাগ্যের জন্যে এক ভাবে মা-কেই দায়ী করে, ছোটবেলায় খুব আঘাত করত গল্পটা। কত সময় ব্যয় করেছে ত্রিদিব শুধু এই গবেষণায় — আঁচিলের ক্ষমতা জেনে এটা করেছে মা, নাকি না- জেনে। যদি জেনে করে থাকে, কেন? মেরে ফেলতে চেয়েছিল? আর যেহেতু চার ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রিভিলেজড, সুবিধাপ্রাপ্ত ত্রিদিবই, ওই দুই ভাইয়ের মত সে মরে যায়নি, বা রাজীবের মত সে নিশ্চলও নয়, শুধু যে জীবন্ত তাই নয়, নড়তেও পারে, তাই, এই ভাবনা ত্রিদিবের মাথায় আসতই দু-চারবার, যে, মা আসলে তাকেই সবচেয়ে ভালবাসত। তাই দুজনকে মেরে, এবং একজনকে নিশ্চল করে দিয়ে সমস্ত সচলতা সক্রিয়তা ত্রিদিবের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করেছিল, সচেতনে, আঁচিলটাকে উড়িয়ে দিয়ে। মাথাতেই আসত না : ত্রিদিবকে ভালবাসতে গেলে আগে ত্রিদিবকে জানতে হবে, আর এই গোটাটাই ঘটছে তার জন্মের আগে।

আগের প্যারায় বারবার লিখছিল 'মা' শব্দটা, সঙ্গে সঙ্গে, শব্দটার উল্লেখের পরই, ত্রিদিবের একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। এই উল্লেখগুলো তো এমনই হয়, যেন, এই উল্লেখের মধ্যেই একটা সম্বোধন রয়ে যায়। লেখায় একটা নাম ধরে ডাকা মাত্র নিজের মনেও একটা বলে ওঠা, একটা ডেকে-নেওয়া এসে যায়। কিন্তু ত্রিদিবের এই উল্লেখের মধ্যে যা রইল তা একটা জৈবনিক সম্পর্কের রেফারেন্স মাত্র। সে কোনোদিন 'মা' বলে ডাকেনি। শুনেছে, জন্মান্ধরা নাকি কোনো দৃশ্য-ভিত্তিক স্বপ্ন দেখে না। কারন, স্বপ্নের দৃশ্যগুলো দেখতে গেলে আগে দেখতে শিখতে হয়। তেমনি, এইখানেও, জানে ত্রিদিব, তার এই 'মা' উল্লেখটাকে পাঠক যে ভাবে পড়বে, সেটা তার নিজের অর্থের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। লেখক যাই চাক, তার ইচ্ছিত অর্থের থেকে পাঠকের আহরিত অর্থ আলাদা হয়ে যায়, আবার একটা টেনশনও থাকে লেখকের, চেষ্টা তাকে করতেই হয়, ঠিক যা বলতে চায় সেটাই পৌঁছে দেওয়ার। এইরকম অনেক জায়গায় সেটা ভেঙে পড়ে, ভাষা ও বাচনের নিজস্ব সীমাবদ্ধতায়। একই বাংলা ভাষা, তার মধ্যেও কত আলাদা আলাদা ভাষা ।

'মা' ডাকটা নিয়ে এই অস্বস্তিটা ত্রিদিবের রিপোর্টেরই অংশ। মা-কে কোনোদিনই 'মা' বলে ডাকেনি ত্রিদিব, রাজীব বা অন্য দুই ভাইয়ের তো ডাকার প্রশ্নই ছিল না। এটা ছিল খুব প্রথমদিকের একটা সঙ্কেত, যা ত্রিদিবকে নিজের তথা নিজের মত নিজেদের বিষমানুষতার ইতিহাস খোঁড়ার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। কেন মা মারা যাওয়ার আগে অব্দি তাকে আর রাজীবকে, তখনো খাটের গল্প আসেনি, বন্ধ থাকতে হয়েছে দুটো ফুটো-দেওয়া কাঠের বাক্সে, সিঁড়িঘরের

নিচে একটা তালাবন্ধ ভাঁড়ারঘরে, এটা সব সময়েই একটা প্রশ্ন থেকেছে ত্রিদিবের কাছে। মা কেন তাদের উপস্থিতি অস্বীকার করতে চাইত? এবং এর মধ্যে তাদের মেরে ফেলতে চাওয়া গোছের কোনো নির্মমতা কোনো দিনই ছিল না। শুধু তাদের গোপন রাখা হত। তার আর রাজীবের দৈর্ঘ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম করে বাক্সদুটোর আয়তন বাড়ানো হত, দু-বেলা পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হত ত্রিদিবের ঢাকনা খুলে, রাজীবের ড্রিপ বদলানো হত। এমন কি হতে পারে যে, ঠিক জন্মের সময়ই তাদের চার ভাইয়ের দুজনের মৃত্যু হয়ে যাওয়ায়, মা বা মামা তাদের নিয়ে একটা বাড়তি মৃত্যুভয়ে ভুগত? সেই জন্যেই কি, ত্রিদিব আর রাজীবের ন বছর তিন মাস বয়স অব্দি, মা মারা যাওয়ার আগে অব্দি, তারা কখনো মা-র বা মামা-র দু-এক টুকরো চকিত কণ্ঠস্বরের বেশি শুনতে পায়নি, বা বাক্স বদলানোর দিনগুলোয় দু-এক আকস্মিক ঝলকের বাইরে কখনো দেখতে পায়নি? মা-মামা আসলে আতঙ্কিত ছিল, স্নেহ বেড়ে ওঠার, মায়া বেড়ে ওঠার?

কিন্তু সব কিছু বিচার বিবেচনার পর, ত্রিদিবের মনে হয়েছে, মা-মামা কোনো এক ভাবে জানত এই বিষমানুষতার ব্যাপারটা। কারণ, এই একই ঘটনা অন্য আরো কিছু অব্যক্ত বিষমানুষের বেলাতেও ঘটতে দেখেছে। ব্যক্ত হয়ে গেলে সচরাচর তাদের মেরেই ফেলা হয়। নিজের পরিবার থেকেই হোক, বা সামাজিক নিধন। মানবসভ্যতার ইতিহাস ও ভূগোল জুড়ে বিষমানুষদের প্রতি বিভীষিকার কথা আগেই এসেছে। যুগের পর যুগ ধরে ঘটতে থাকলে, পুনরাবৃত্ত ঘটনাগুলোর একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ গড়ে ওঠেই, বেঁচে থাকতে হলে যা শিখতেই হয়। হয়ত এটা বহু হাজার বছর ধরে অব্যক্ত বিষমানুষ পরিবারগুলোর একটা আত্মরক্ষামূলক আচরণ-রীতি, সারভাইভাল স্ট্র্যাটেজি। এর মধ্যে সন্তানকে রক্ষা করার, আগলানোর, একটা মৌল- প্রবণতাও কাজ করে হয়ত। লুকিয়ে রাখো, যতদিন-না যথেষ্ট সময় যায়, যতদিন-না নিশ্চিত ভাবে বোঝা যায় যে, এ অব্যক্তই থাকবে। কারণ, সাত আট বছর বয়সে এসেও বিষমানুষতার লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠার ঘটনা ত্রিদিব নিজেই পেয়েছে। তাহলে কি একটা সময় অব্দি বিষমানুষ-বিষয়ক অবরুদ্ধ তথ্যগুলো একটা গোপন আন্ডারগ্রাউন্ড জ্ঞান হিশেবে বাঁচিয়ে রাখা হত? অন্তত সেই পরিবারগুলোয় যেখানে ব্যক্ত বা অব্যক্ত রকমে এই জিনগত উত্তরাধিকারটা আছে?

বাবা-কে দেখেনি ত্রিদিব, তাদের চার ভাইয়ের 'বাবা' বলে যার পরিচিতি থাকার কথা, তার সম্পর্কে খুচরো জনশ্রুতির বাইরে কোনো কিছু আজো খুঁজে পায়নি। এমনকি সেই লোকটা জীবিত না মৃত, স্থাপিত না নিরুদ্দেশ, তাও জানে না। ছোটবেলা থেকে মামার আবাস আশ্রয় আর অর্থে তারা পালিত হয়েছে। মামা ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের কর্তৃত্বব্যাঞ্জক উপস্থিতি কখনো জানেনি তারা। এই জায়গাটা নিয়েও মনোযোগ দিতে হয়েছে ত্রিদিবকে। পয়জন পিপলের উত্তরাধিকার তাদের মধ্যে এসেছে কোন দিক থেকে? শুধু মায়ের দিক নয় তো? সত্যিই তাদের বাবা বলে কেউ ছিল তো? নাকি মামাই তাদের বাবা? কারণ, লোকের কাছে বিষমানুষতা প্রকাশ হয়ে ওঠার ভয়ে, অব্যক্ত বিষমানুষ পরিবারগুলোয় অন্তর্বিবাহের একটা প্রবণতা প্রচুর খুঁজে পেয়েছে ত্রিদিব। হয়ত আরো পেত। এখানে একটা বড় সমস্যা গোপনীয়তা। ব্যক্ত এবং প্রকট হয়ে ওঠার আগে অব্দি কেউ কখনো প্রকাশ করে না। আর ব্যক্ত হওয়া মাত্রই এদের মেরে ফেলা হয়। দু-একটা ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতাল অব্দি পৌঁছয় ঠিকই, কিন্তু সেই তথ্য আর কারুর পাওয়ার উপায় থাকে না। গুপ্ত মহাফেজখানায় বন্দী হয়ে যায়। আর বিষমানুষ বিভীষিকাটা মানবসভ্যতা জুড়ে এত সর্বব্যাপী যে, রাজনীতি বা সরকার বা দেশ নিরপেক্ষ ভাবেই তারা সংরক্ষিত তথ্য হয়ে পড়ে। তবে থাকে সেটা, তুলে রাখা থাকে, সরকারি তরফে, সব দেশেই, এটা ধারণা ত্রিদিবের। শুধু সাইবার-ইন্ডাসের প্রভাব নয়, এখন সে সত্যিই এটা বিশ্বাস করে। এবং, মনে হয়, সমস্ত দেশ মিলিয়ে একটা নির্দিষ্ট নীতি এবং সিদ্ধান্ত আছে বিষমানুষ সংক্রান্ত তথ্যগুলোর ব্যাপারে — সমস্ত দেশ সর্বসম্মত রকমে যা মেনে চলে। নইলে, নিশ্চিতভাবেই, এতটা পরিব্যাপ্ত এবং অপ্রশ্নেয় নৈঃশব্দ্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এই লেখায় এসে রিপোর্টের সমস্ত আলাদা আলাদা বিষয়গুলো একটা জায়গায় মিশে যাচ্ছে, কিন্তু আদতে এর অনেক জায়গাই খুব তরল এবং পরিবর্তনীয় । নিজের জীবন ত্রিদিবের কাছে সবচেয়ে বড় তথ্যসূত্র, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক সংবাদপত্রের রিপোর্ট, অনেক মানুষের জীবনের অনেক টুকরো টুকরো অংশ। এই সমস্ত বহুমুখী খণ্ডগুলোকে মিলিয়ে আবার অনেক সমাপতন ঘটেছে, যার অনেকগুলো সমাপতন অত্যন্ত অসম্ভাব্য, কিছুতেই যাদের ব্যাখ্যা করা যায় না। কোনো কোনো সমাপতন সত্যিই অবিশ্বাস্য । এরা না-ঘটলে ত্রিদিবের মাথায় তথ্য ছবি ও চিন্তার টুকরোগুলো মিলে যেতে পারত না। যেমন তাদের বাড়ি থেকে বেরোতে গলির মুখে ব্যাংকটার যে দারোয়ান। তাকে আগেও

অনেকবার দেখেছে ত্রিদিব, গলিতে বেরোতে ঢুকতে। বেশ কয়েকবার তার সঙ্গে এমন নারীদের দেখেছে, যাদের কম টাকার বেশ্যা বলে সহজেই চেনা যায়। দারোয়ানটির অবয়ব এবং ব্যবহারে তাকে গ্রাহকের চেয়ে বরং সংগ্রাহক বলেই মনে হয়েছে। ত্রিদিবের চোখে পড়েছে, দেখেনি আলাদা করে।

সেদিন, সামনেই মিউনিসিপালিটি নির্বাচন, রাস্তা সংস্কার চলছে চলবে, প্রচুর খোয়া, আরো প্রচুর আরো কীসব, তার মধ্যে লোডশেডিং, তার মধ্যে বাড়িতে বাড়িতে জেনারেটরের আলো রাতের আকাশের আলোটাকে নষ্ট করে রাস্তার বারোয়ারি অন্ধকারটাকে ফাটিয়ে দিয়েছে। প্রায় গলির মুখ অব্দি পৌঁছেছে ত্রিদিব, এই সময়ই কারেন্টটা এল, মোড়ের হ্যালোজেন ঠিকরে পড়ল সস্তার বেশ্যার সস্তা পাউডার মাখা মুখে। প্রচুর অপব্যবহারে সতত খুব ক্লিষ্ট হয় এদের মুখ, করুণ। দু-এক মুহূর্ত ত্রিদিবের চোখ পড়ে রইল, এবং ঠিক তখনই চমকাল। এই মুখটাই দেখেছিল সেদিন খবরের কাগজে। নিশ্চিত ত্রিদিব। ততদিনে বিষমানুষদের ভূগোল-ইতিহাস-নৃতত্ব-জেনেটিক্স খোঁজার প্রোজেক্টটা শুরু হয়ে গেছে তার। এর সঙ্গে দূরতম সম্পর্কও থাকতে পারে এমন কিছু আর তার দৃষ্টি পেরিয়ে যায় না, মাথার ভিতরে গেঁথে যায়। আর, এই খবরটা সে খুবই মনোযোগ দিয়ে পড়েছিল। কেসটা সত্যিই বেশ অদ্ভুত, ব্যক্ত আর অব্যক্তের একটা মাঝামাঝি জায়গা। পরে অবশ্য এরকম আরো দেখেছে।

ওই কয়েক লহমা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই গোটাটা মিলিয়ে নিতে পারল ত্রিদিব। এগিয়ে আসা মুখ, নিচু অগঠিত চিবুক, জেগে ওঠা ভুরু আর পিছিয়ে যাওয়া কপাল শুধু নয়, গোটা মুখটায় দু-এক ঝলক তাকিয়ে থাকলেই বোঝা যায়, এটা ঠিক মুখ নয়। মানে সেই মুখ নয়, মুখ বলতে আমরা যা বুঝি। এই মুখটার ছবি বেরিয়েছিল কাগজে, হাসপাতালের করিডোরে বসে কাঁদছে। তার তিনটি বাচ্চা হয়েছিল কাঁচরাপাড়া স্টেশনে, তিনটিকেই বাঁদরের মত দেখতে। খবরের কাগজে তাই লিখেছিল। কিন্তু ত্রিদিব জানে, ওটা বাঁদর না, হবে নিয়ান্ডারথাল বা হোমো সেপিয়েন্স নিয়ান্ডারথালানাসিস। সাংবাদিক হওয়ার জন্যে নিরক্ষর হওয়াটা প্রায় একটা প্রাথমিক শর্ত। পারমাণবিক বোমাকে এমন ভয়ানক ভাবে আণবিক করে দেওয়া হয়েছিল যে, বাংলা সিনেমার গানে অব্দি চলে এসেছিল — আণবিক সে দানবিক সে, মৃত্যুনৃত্য নেচে — ইত্যাদি।

এখানে একটু টেকনিকাল খুঁটিনাটি নিয়ে রাখা রিপোর্টের পরের অংশে যাওয়ার জন্যে খুব জরুরি। নিয়ান্ডারথাল ম্যানের অবশেষ প্রথম পাওয়া যায় ১৮৫৬-য়, জার্মানির ডুসেলডর্ফে, নিয়ান্ডার উপত্যকায়। পরে পাওয়া গেছে ইউরোপ আফ্রিকা এশিয়া সব জায়গাতেই। এরা মানুষ বা হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতিরই একটা সাব-প্রজাতি। শেষ তুষারযুগের শুরুর সময়টায় তুষারকম্প ইউরোপের কোনো এক জায়গায় এদের উদ্ভব হয়, প্রায় ১,২৫,০০০ বছর আগে। পরে, তুষারযুগ শেষ হলে, কম প্রতিকূল প্রকৃতির আনুকূল্যে এরা ছড়িয়ে যায় সব জায়গাতেই। মানুষ বলে যাকে বুঝি আমরা, সেই হোমো সেপিয়েন্সের সঙ্গে তার সহোদর নিয়ান্ডারথালের কাঠামোগত আত্মীয়তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, রুডলফ ভারশোর আবিষ্কৃত প্রথম নিয়ান্ডারথাল অবশেষটাকে দীর্ঘদিন অব্দি ভাবা হয়েছিল ভিটামিন ডি-র অভাবে ভোগা মানুষেরই অবশেষ বলে, যার খুলিটা কোনো আঘাতে থেঁতলে গেছে। এখন এই নিয়ান্ডারথালদের অবলুপ্ত বলেই ধরে নেওয়া হয়। এদের বেঁচে থাকার সাম্প্রতিকতম চিহ্ন যা পাওয়া গেছে তা ২৮,০০০ বছরের পুরোনো। যদিও, কেউ কেউ এমন সন্দেহও করেন, হিমালয়ের ইয়েতি আসলে নিয়ান্ডারথাল, এবং হয়ত পার্বত্য হিমালয়ের উচ্চতম মানুষ-বসতিগুলোয় এদের সঙ্গে মানুষের বিনিময় সম্পর্কও কাজ করে — মূলত এদের প্রয়োজন পড়ে নুন, তার বদলে এরা দেয় শীতের বরফঢাকা হিমালয়ের মানুষের বেঁচে থাকার একটা জরুরিতম উপাদান, কাঠ, শীতের কয়েক ফুট বরফের তলায় যা আরো দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। নিয়ান্ডারথালদের ধর্ম-বিশ্বাস বা শিল্প-ধারণা বিষয়ে প্রায় কিছুই জানা যায় না, জানা যায় না তারা কথা বলতে পারত কিনা বা কতদূর পারত। নিয়ান্ডারথালদের অবলুপ্তি বিষয়ে দুটো পরস্পরবিরোধী মত আছে। এক, ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় এদের সঙ্গে সংঘাত হয় হোমো সেপিয়েন্সের এবং পরাজিত নিয়ান্ডারথালরা ক্রমে অপসারিত অপনোদিত অবলুপ্ত হয়। দুই, আদিম হোমো স্যাপিয়েন্সের সঙ্গে শরীরি সংগঠনগত প্রভেদক্রমে ক্ষীণ তরল অনস্তিত্ব হয়ে আসে, অবিরত জিন-সংমিশ্রণের কারণে, শেষ অব্দি গোটা নিয়ান্ডারথাল জিনপুলটার কিছু অংশ আত্তীকৃত হয়ে যায় আধুনিক হোমো সেপিয়েন্সের জিনসমগ্রে, এবং অবশিষ্ট অনেকটাই পরিত্যক্ত হয়, শেষ অব্দি যা রয়ে যায় তা হল মডার্ন ম্যান, আধুনিক হোমো সেপিয়েন্স — যে আকারে আজ আমরা তাকে পাই, যার সভ্যতাই মানবসভ্যতা, যার ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস।

এই প্রসঙ্গটায় আসছি, আগে ওই সস্তা শরীরের নারীর কথাটা শেষ করে নেওয়া যাক। খবরের কাগজের ছবিটায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল নারীটিকে, তার মুখের চোয়ালের চিবুকের গড়ন। সঙ্গে তার অবশিষ্ট তৃতীয় বাচ্চাটা, প্রথম দুটোকে কাঁচরাপাড়া স্টেশনের মানবসভ্যতা-সচেতন জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল। বাচ্চাটাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না, কাপড়ের পুঁটলির মধ্যে পেঁচানো অবস্থায় তাকে অন্য যে কোনো বাচ্চার, মানে আধুনিক হোমো সেপিয়েন্সের বাচ্চার মতই লাগছিল। হতে পারে যে, নিজের অনামকৃত দুই ভাইয়ের কথা মাথায় ছায়া ফেলেছিল ত্রিদিবের, বা, এটাও হতে পারে যে, এই বাচ্চাটা একটা অব্যক্ত কেস, বা, ওর মার মতই, ব্যক্ত আর অব্যক্তের একটা বর্ডারলাইন। অন্য দুটোকে লোকে মারল, এ বেঁচে গেল, এই পৃথক ভবিতব্যের ব্যাখ্যা হয়ত এটাই।

খবরে ছিল, তৃতীয় বাচ্চাটি এখন সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারের পর্যবেক্ষণে রয়েছে। তারা গোটাটা বৈজ্ঞানিক ভাবে বোঝার চেষ্টা করছেন। এর তিন দিন পরে, খবরের কাগজের খবরে ফের ফেরত আসে নারীটি। খুবই ছোট্ট একটা খবর। ত্রিদিবের খুঁড়ে চলার মধ্যে না-পড়লে, অন্য অনেকের মতই ত্রিদিবেরও হয়ত চোখ এড়িয়ে যেত। খবরে ছিল, নারীটিকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। সন্তানের সঙ্গে তিনিও পর্যবেক্ষণে ছিলেন, কিন্তু হাসপাতালের প্রহরা এড়িয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। গলির মুখের কারেন্ট আসা আলোর ঝলকে ত্রিদিব না-জেনেই আবিষ্কার করে ফেলেছিল, নারীটি এখন কোথায়। রিপোর্টে পরে আমরা দেখব, এখানে একটা বড় জিনিস শেখার ছিল ত্রিদিবের। তার পরবর্তী খুঁজে চলার প্রক্রিয়ায় এটা একটা বিরাট ছায়া ফেলবে। কোথায় ভীতি-স্নায়ুরোগ বা প্যারানইয়া শেষ হয়, এবং কোথায় উচ্চতর সংবেদনশীলতা বা হাইটেন্ড অ্যাওয়ারনেস শুরু হয়, এটা ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার ছিল তার, বিষমানুষ বিষয়ক তার রিপোর্টটাকে ন্যূনতম কোনো অর্থপূর্ণতা দেওয়ার জন্যে।

বিষমানুষ এবং বিষমানুষ সংক্রান্ত তথ্য খুঁজে চলাটাকে ত্রিদিব নিজেও অনেকদিন অব্দি একটা স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া বলে বুঝতে পারেনি। নিশ্চল রাজীব, অনামিত দুই ভাই, এবং নিজেদের বাল্য তথা কৈশোরের ওই ঘটমানতাগুলো নিয়ে, স্বাভাবিক ভাবেই, নানা গরমিল, নানা ভাঙচুর, নানা না-মিলে ওঠা — এবং এই সবকিছুর কারণে তার মধ্যে নানা সঙ্কট ছিলই। সঙ্কটটা শুধু তার না, তাদের চার ভাইয়ের, কিন্তু ওরা আর ভাববে কী, ভাবনা তথা ক্রিয়ার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই, একা তার। এটা সে এখনো মনে করে, রাজীব আসলে গোটাটাই ভাবে এবং বোঝে, চিন্তা করে। শুধু চিন্তানুগ কোনো ক্রিয়ায় পৌঁছতে পারে না। হতে পারে, এই ভাবাটা আসলে ত্রিদিবের অত্যধিক আবেগপ্রবণতা। কিন্তু সে ভাবে এটা। মাঝে মাঝেই রাজীবের কাছে গিয়ে বসে ত্রিদিব, শোনায় তার খোঁজা আর খুঁজে পাওয়ার বৃত্তান্ত। প্রতিটি খুঁটিনাটি। যেন রাজীব একটা শান্ত স্থির ব্যাক-আপ। সব কিছু তোলা থাকছে রাজীবের মাথায়। কোনো একদিন বেরোবে একটা প্রকৌশল, যা দিয়ে তুলে আনা যাবে গোটাটাকে। ত্রিদিব তখন আর না-থাকলেও। না-থাকার ভয়টা আজকাল সে প্রায়ই পায়। সাইবার-ইন্ডাস হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে। রাজীবের সামনে বসে, কখনো কখনো গোঙানিটা পশ্চাতপটে, ত্রিদিব তার দেখা এবং ব্যাখ্যাগুলো বলে চলে, বলতে বলতেও আবার অনেককিছু নতুন করে মিলে যেতে থাকে, নতুন কিছু মাথায় আসে, নতুন কোনো ছক যা পাওয়া তথ্যগুলোকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করে।

এই ভাবে একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে ত্রিদিব, নিজে ভাল করে না-জেনেই, বিষমানুষ বিষয়ক তার রিপোর্টটার গোড়াপত্তন করে চলছিল। কিন্তু সচেতন প্রক্রিয়া হিশেবে রিপোর্টটা জেগে ওঠার জন্যে দরকার পড়েছিল ইন্টারনেট আর নেট থেকেই পাওয়া ইন্ডাসকে। নেটে ওর পরিগৃহীত নিকনাম সাইবার-ইন্ডাস, ছোট করে ইন্ডাস। নেটে তো তাই হয়, নিজেই নিজের নামকরণ এবং পিতৃত্ব। নেট আর ইন্ডাস এই দুটো উপাদান মিলে একটা অনুঘটকের কাজ করেছিল। যা ছিল নিজের তথা নিজেদের ব্যক্তিগত সঙ্কট, এবং তার চারদিকে নানা বেদনা আর হাতড়ে বেড়ানো, সেটা ক্রমে দেখা দিয়েছিল একটা সচেতন সক্রিয় অনুসন্ধানের আকারে। একটা প্রক্রিয়া যা তার নিজের চেয়ে বড়। বড় আরো অনেক কিছুর চেয়েই। এবং হয়ত বড় হোমো সেপিয়েন্স বা হোমো সেপিয়েন্স নিয়ান্ডারথালানাসিস-এর চেয়েও।

এর আগে এই গোটাটায় কতকগুলো সমাপতনের গুরুত্বের কথা এসেছে। একটা সমাপতন কাজ করেছে এখানেও। সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে একটা আকর্ষণ ত্রিদিবের চিরকালই ছিল। কেন ছিল? এটা এখন মাঝে মাঝেই মনে হয় ত্রিদিবের। সময় ইতিহাস ভূমি-কাল-সমগ্র — এর কোনো গোপন ছক থাকে? আপাতনির্বাক এই বাস্তবতা কিছু সূত্র ছড়িয়ে দিতে থাকে? কারুর একার নয়, সকলের জন্যে? যে পায় যখন তাদের পেয়ে ওঠে, একটা একটা করে তারা জমা হতে থাকে? অপেক্ষা করে চলে কিছু সমাপতনের? কখনো মেলে, কখনো মেলে না। হয়ত এরকম এক সূত্রের আকারেই

তার কাছে আসত হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো, লোথাল, চানহুদরো, কালিবঙ্গান — ওই বালি, ওই লুপ্ত নদী, ওই আক্রান্ত নগর, ওই বর্বর আর্য, এবং তাদের অয়স অশ্ব ও জৃম্ভণের মিলিত রক্তাক্ততা। সূত্রটা তার কাছে আসত বলেই, পরে, একটা অন্য খোঁজার সঙ্গে মিলে যেতে পারল, নেট আর ইন্ডাসের অনুঘটনে?

সিন্ধু সভ্যতা, তারও আগের বালুচ-রা, সিন্ধুর টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, সিন্ধু সংস্কৃতির টুকরো হয়ে ছড়িয়ে মিশে যাওয়া আগত এবং বিজয়ী আর্যদের ধর্মে তত্ত্বে আচারে প্রকৌশলে, যোগদর্শনে, সাংখ্যে, অথর্ববেদের পুরানপুরুষে, শিব-দুর্গা-শাকম্ভরী-ভগবতীতে — এই গোটাটাই, এখন ভাবে ত্রিদিব, এটাও কি পুনরাবৃত্ত করছে না হোমো সেপিয়েন্স নিয়ানডারথালানাসিস-এর জিন-প্রবাহের সেই একই গতিপথ? এই রিপোর্টটাও ঠিক সেটাই করছে, আর একবার। অনেক কিছুকে এক জায়গায় এনে মিলিয়ে দিচ্ছে। আর মেলানো মাত্রই রয়ে যাচ্ছে শুধু মিলে যাওয়া অর্থটা, যেন একমাত্র রিপোর্টে মেলার জন্যেই তারা ছিল, যেমন আধুনিক হোমো সেপিয়েন্সের জনজিনোমে নিয়ানডারথাল, যেমন আর্য সংস্কৃতিতে সিন্ধুপ্রবাহ।

ইন্টারনেটে সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে নতুন কিছু খুঁজত ত্রিদিব। তাকে উত্তেজিত করত সিন্ধু-লিপির পাঠোদ্ধার, ডিসাইফারিং। একটা এলাকা যেখানে যাদু গণিত ইতিহাস ভাষা আর রোমাঞ্চ একত্রিত হয়েছে একই আধারে। সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার, তার সদা-অসফল এবং সদা-রোমাঞ্চিত যাত্রায়, নিজেই একটা উপাখ্যান হয়ে গেছে। এর জন্যে অনেক সাইটেই যেত ত্রিদিব। একদিকে, ডিসাইফারিং এর গণিত, অন্য দিকে নোরোজভ, আসকো পারপোলা, ইরাবতম মহাদেবন ইত্যাদির সিন্ধুলিপির কাজ। নেটে ঘোরাঘুরির সময় খরচের কথাটা ত্রিদিবকে মাথায় রাখতেই হত। অকৃতদার মামার মৃত্যুর পর থেকে গোটাটা তাদের চারজনের। তার মধ্যে দুজন গোড়া থেকেই নেই, আর রাজীব থেকেও নেই, তবে রাজীবের জন্যে ব্যয়টা আছে, তাই গোটাটাই এক ভাবে ত্রিদিবের। কিন্তু সেটা অফুরান নয়। আর, একটা মফস্বল মিউনিসিপ্যালিটিতে বসে, সীমিত অর্থনৈতিক সামর্থে, ব্রড-ব্যান্ড নয়, ওকে কাজ করতে হচ্ছিল ডায়াল-আপ কানেকশনে, টেলিফোন লাইন দিয়ে। তাই, নেটে ঘোরাকালীন মাথায় রাখতেই হত — আর একটু দেখা মানে আর একটা কল, টেলিফোন বিল বাড়ছে। তাই, প্রথম থেকেই, কোনো সাইটে দরকারি কিছু পেলে, সাইটের বেছে দেওয়া অংশে হাইপারলিংক ধরে ধরে সম্পর্কিত সব ওয়েবপেজ স্বয়ংক্রিয় ভাবে নামিয়ে আনার জন্যে ডব্লগেট গোছের কোনো সাইট-কপিয়ার প্যাকেজ ব্যবহার করত ত্রিদিব। খুব দ্রুত এতে নির্বাচিত সাইটের নির্বাচিত অংশটা নেমে আসে, সেখানে লিংক-করা সমস্ত রিসোর্স সহ। পরে, নিজের মেশিনের হার্ডডিস্ক থেকেই একটা টুকরো ওয়েবসাইটের মত করে পড়া যায়। এখন অভ্যেশ হয়ে গেছে, ভাল কোনো সাইট পেলেই ইউআরএলটা তুলে রাখে ত্রিদিব। তারপর, ভোর তিনটে নাগাদ উঠে, তখন উঠতেই হয়, রাজীবের বিছানা পাল্টানো, ড্রিপ বদলানো, পরপর সাইটগুলো নামিয়ে আনে। ওই সময়টা ইন্টারনেট ফ্রি, টেলিফোন চার্জ কম। সাইট-কপিয়ারে নামাতে দিয়ে, রাজীবের কাজগুলো করে দিয়ে, ওর দিকে তাকিয়ে বসে থাকে ত্রিদিব। এটা একটা অদ্ভুত সুযোগ, নিজেকে ঠিক কেমন দেখতে এটা জানতে তার কখনো আয়না দেখতে হয় না, রাজীবকে দেখে নিলেই চলে। নিজের চুল আঁচড়ে মাঝে মধ্যে ভুল করে রাজীবের দিকে তাকায় ত্রিদিব, ঠিক হল সিঁথিটা? তারপর, নিজের মনেই হেসে ফেলে, এবং, কোথাও সত্যিই সঙ্গতিটা রাখার জন্যে, নিজের আর নিজের আয়নার মধ্যে, রাজীবের চুলটাও আঁচড়ে দেয়। রাজীব কোনো আপত্তি করে না, তাই, ভুল ভাবছে জেনেও, এটা তার একমাত্র সনাম ভাইয়ের কাছে নিজের গ্রহণ বলে ভেবে নেয় ত্রিদিব, ভেবে নেয় একটা অপ্রতিরোধ্য ভালবাসা বলে।

রিপোর্টের সাইবার-ইন্ডাস প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক — এই রিপোর্টটা এক অর্থে সাইবার-ইন্ডাসের স্মৃতি-তর্পণও। নেটে নানা সাইটের নানা মেসেজবোর্ডে নানা জনের নানা ব্যক্তি মতামত পড়তে গিয়ে ত্রিদিব প্রথম পায় নামটা, সাইবার-ইন্ডাস, ছোট করে ইন্ডাস। নিজের মতামত পোস্ট করার সময় ইতি দিত ইন্ডাস লিখে। ইন্ডাসের লেখাতেই ত্রিদিব, প্রথমবার একই সঙ্গে পায়, সিন্ধু-সভ্যতা আর নিয়ান্ডারথালের প্রসঙ্গ। প্রথম দিকে খুব একটা মন দিয়ে ইন্ডাসের লেখা পড়ত না ত্রিদিব, ভয়ানক রাগ থাকত পোস্টগুলোয়, মার্কিন সরকার, তথা যে কোনো সরকারের প্রতি, প্রায় প্রতিটি বাক্যাংশে একটা করে মুখখিস্তি থাকত। আর থাকত একটা সর্বব্যাপী সন্দেহ। পৃথিবীর যাবতীয় কিছুর প্রতি। সব কিছুর মধ্যেই ষড়যন্ত্র দেখতে পেত সাইবার-ইন্ডাস। ওর একটা পোস্টেই পেয়েছিল ত্রিদিব, এই রিপোর্টে ইতিমধ্যেই লাগানো বাক্যাংশটা, প্যারানইয়া ইজ নাথিং বাট এ হাইটেন্ড অ্যাওয়ারনেস। কিন্তু ক্রমে, প্রাচীন ইতিহাস, ডিসাইফারিং বিজ্ঞান, আর জেনেটিক অ্যান্থ্রপলজিতে ইন্ডাসের অগাধ পাণ্ডিত্য টের পায় ত্রিদিব। ইন্ডাসের সঙ্গে

যোগাযোগ করার চেষ্টাও করে। কয়েকটা মেল লেখে। উত্তর দেওয়ার সূত্রে ইন্ডাস জানায়, সে ফার ইস্টের, দূর প্রাচ্যের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে একটা প্রোজেক্টে যুক্ত, যাকে ফান্ড দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে মার্কিন সরকার, পুরোটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে চাইছে, কারণ, গবেষণার ফলাফল তাদের মনোমত নয়।

ইন্ডাস লিখেছিল, সিন্ধু লিপি গোটাটাই তাদের ডিসাইফার করা হয়ে গেছে, তাতে স্পষ্ট প্রমাণ করা যাচ্ছে, দূর প্রাচ্যের সিন্ধু, ব্যাবিলন, মিশর এবং ক্যাথে, আর মধ্য তথা দক্ষিণ আমেরিকার ইংকা সভ্যতা — এরা নিশ্চিত ভাবেই হোমো সেপিয়েন্স সভ্যতা নয়, এদের নির্মাতা হোমো সেপিয়েন্স নিয়ানডারথালানাসিস নামের অবলুপ্ত উপপ্রজাতি। ইন্ডাস এটাও বলেছিল, এটা সেই অর্থে কোনো অজানা দিগন্তের উন্মোচন নয়। সরকারি তরফে এই তথ্য বহু যুগ ধরেই জানা। তারা এটা জানে এবং গোপন করে। ত্রিদিব মানতে চায়নি, এত বড় একটা আবিষ্কার এবং সেটা গোপন করে যাওয়া — এটা কি সম্ভব আদৌ? প্রথম থেকেই ইন্ডাসকে একটু বাতিকগ্রস্ত একটু স্নায়বিক লাগছিল তার, জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি যাই হোক। এটা কখনো হতে পারে? এতগুলো দেশ, এতগুলো মানুষ, এত ইউনিভার্সিটি, এত বই, এত লাইব্রেরি জুড়ে এত বড় একটা আবিষ্কার অনুচ্চারিত থেকে যেতে পারে?

ইন্ডাস মেল করেছিল, তথ্যকে গোপন করার জন্যে লাখ লাখ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় না। তথ্যটা যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু করে, সেখানে থাকে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা লোক, তার মানে, এই ক্ষেত্রে, হাতে গোনা কয়েকজন কর্তৃস্থানীয় হোমো সেপিয়েন্স, যারা বেড়ে উঠেছে, বড় হয়েছে, ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছে এই হোমো সেপিয়েন্স উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে, সিন্ধুর নগরনির্মাণ, ব্যাবিলনের সূর্য-উপাসনা, ইংকার মন্দির-অবজারভেটরি, মিশরের গিজা, চিনের পটারি, এগুলো তাদের আশৈশব গৌরব ও আত্মপরিচিতির বিন্দু, এদের নিরিখেই নিজেদের চিনেছে এবং বানিয়েছে তারা। এবার, যখন অনেক প্রস্তুতির পর, যখন তারা নিজেরাই প্রত্যেকে এই সভ্যতার এক একটা নিরিখ হয়ে উঠেছে, তখন তাদের হাতে আসছে এই তথ্য। এবার তারা প্রত্যেকেই এই তথ্যে আতঙ্কিত, কারণ নিজের অস্তিত্বকে তারা নিজেরা যে ভাবে বুঝে এসেছে এতদিন, সেটা এবার ঘুলিয়ে যাচ্ছে। তারা প্রত্যেকেই এই তথ্যের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে। আর, এই রকম পরিস্থিতির জন্যে একটা যুক্তি সমাজে ও সভ্যতায় বহু বছর ধরে তৈরি আছে — সাধারণ মানুষ এই তথ্যের জন্যে তৈরি নয়, কারণ, আসলে তৈরি নয় তারা নিজে। এই হাতে গোনা কয়েকটা মানুষ মিলে যেই এ বিষয়ে একটা ঐকমত্যে পৌঁছতে পারল, ব্যাস, খেল খতম। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা নৃতত্ত্ব করে যাচ্ছে, তাদের কারো কাছে এর একটা কণাও আর পৌঁছল না। এর পরে যদি কখনো, কোনো ভাবে, আহরিত এবং প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষকদের কারুর কখনো মাথায় আসে অন্য কিছু, সে ঠিক তোমারই মত করে ভাববে, নিজেই অবিশ্বাস করবে এটা। তাই, আর খুঁজবে না। তাই, নৈঃশব্দ বজায় থাকবে।

ইন্ডাসের এই সব কথা ভাবাচ্ছিল ত্রিদিবকে। এটাও মনে হচ্ছিল, কোনো সংবেদনশীল স্কাই-ফি ছবি থেকে যেন তুলে নেওয়া কথাগুলো, যেন ভিন গ্রহের এলিয়েন নিয়ে কোনো শিক্ষিত চিত্রনাট্যে এটা থাকতেই পারত। খুব বেশি সুচিন্তিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত কিছু শুনলে যেমন লাগে — এটা কিছুতেই বাস্তব হতে পারে না, বাস্তব তো এরকম হয় না, সেটা চলে অনেকটা রাজীবের গোঙানির মত, এক ভাবে চলতেই থাকে, চলতেই থাকে, বোধহয় আর কিছু করার নেই বলেই, তারপর কখনো একটা থেমে যায়, তারই বা কারণ কী কে জানে?

কিছুতেই ত্রিদিব ঠিক করে উঠতে পারছিল না, ইন্ডাসের কথাগুলোকে ঠিক কী ভাবে নেবে। এর পরে পরেই এসেছিল ইন্ডাসের শেষ মেল, যার পর আর কোনো মেল পায়নি ত্রিদিব। সেই মেল ইন্ডাস লিখেছিল অন্য কোনো আইডি থেকে। কেন? এই মেলটার মধ্যে কোনো নাম ছিল না সাইবার-ইন্ডাসের বা ইন্ডাসের। সত্যিকারের কোনো নাম তো এটা নয়ই, এমনকি সেটাও ছিল না। শুধু প্রসঙ্গ থেকে বুঝতে পেরেছিল ত্রিদিব, এটা ইন্ডাসের মেল। আর একটা অন্যরকমত্ব ছিল এই মেলটায়, গোটা লেখাটাই নিয়ান্ডারথালদের উপর, তাদের ইতিহাস সূত্রের উপর মানুষের আক্রমণ নিয়ে, কিন্তু কোথাও একবারো গোটা মেল-এ নিয়ান্ডারথাল বা হোমো সেপিয়েন্স নিয়ানডারথালানাসিস কথাটা লেখেনি ইন্ডাস। লিখেছে, 'দি আদার ওয়ানস', 'ওই অন্যরা'। কেন?

এই মেল-এ ইন্ডাস লিখেছিল : তুমি আমি আমরা সবাই একটা গণহত্যার অংশ, পৃথিবী থেকে ওই অন্যদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে, এখন মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে গণহত্যার সমস্ত চিহ্ন। যারা জানার, দোজ হু আর সাপোজড টু নো,

তারা এটা জানে, তাই তাদের জানানো যায় না। আর যারা জানার নয়, দোজ হু আর নট সাপোজড টু নো, তারা এটা জানেনা, তাই বিশ্বাস করে না, তাই তাদেরও জানানো যায় না। এর পরেও, যারা খুব বেশি বিস্মিত না-হয়ে সত্যিই কিছুটা জেনে বা বুঝে ফেলে, তাদেরও নিশ্চিহ্ন হতে হয়, ঠিক ওই অন্যদের মত। তারা সেই গণহত্যার অংশ হয়ে পড়ে, যা তারা জানতে জানাতে চেয়েছিল। আমার যা ঘটবে। ঘটার আগে অব্দি আমি এটা প্রমাণ করতে পারব না, আর, আরো পারব না ঘটে যাওয়ার পরে। ওই অন্যদের ইতিহাস নিয়ে আমার গবেষণার মতই। এটা শুনে একটা প্যারাডক্স লাগছে। ওই অন্যদের ইতিহাসের মতই আর একটা প্যারাডক্স। কিন্তু আমার নেই হয়ে যাওয়াটা কোনো প্যারাডক্স থাকবে না। মৃত্যুটা হবে খুব স্পর্শযোগ্য, ট্যানজিবল, অন্য যে কোনো মৃত্যুর মত। আবার মৃত্যুর সংবাদটা, সেই তথ্যটা, ফিরে আসবে প্যারাডক্সের জগতে। ওই অন্যদের গণহত্যার বিষয়ে তথ্যের মত।

এই মেলটায় ইন্ডাসের কণ্ঠস্বরের নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা, ঔদাসীন্য, শৈত্য — এগুলো ত্রিদিবকে ছুঁয়েছিল অবশ্যই, কিন্তু সেটা কখনো শেষ কথা হয়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে তার চূড়ান্ত জায়গাটা তৈরি হওয়ার পিছনে কাজ করেছিল আর একটা সমাপতন। একটা ছোট্ট কিন্তু মারাত্মক আবিষ্কার। ইন্ডাসের শেষ মেলটা আসার ঠিক আগে আগেই ঘটেছিল এটা। তাই ইন্ডাসের মেলটা সর্বোচ্চ সম্ভব ভয়ঙ্করতায় আঘাত করেছিল তাকে। সাইট কপিয়ার দিয়ে নামানো ওই সাইটাংশগুলোর একটায়, ইন্ডাসের একটা পোস্ট পড়ছিল। অনেক ক্রস-লিংক ছিল তাতে অন্য অনেক ওয়েব-রিসোর্সের। ইন্ডাসের লেখাটাও বেশ বড়, তিন-চারটে টুকরোয়। একটা থেকে পরেরটায় যেমন হয়, একটা পরেরটায় যেতে হচ্ছিল 'নেক্সট' লিংক দিয়ে। সবকটা টুকরো ছিল না, মনে পড়ল ত্রিদিবের, নামানোর মাঝপথে কারেন্ট গেছিল। লেখাটা পড়তে পরের বার নেটে গিয়েই চমকটা পেল ত্রিদিব। প্রথমে অনেকক্ষণ অব্দি নিজের দেখাটাকেই বুঝে উঠতে পারছিল না, কী ঘটছে এসব? সে কি ভুল করছে কিছু? মেসেজবোর্ডের মূল আলোচনাটা চলছিল 'রসেটা স্টোন' নিয়ে, যা দিয়ে ইউরোপ মিশরের পিকটোগ্রাম তথা হিয়েরোগ্লিফ পড়তে শিখেছিল। সেই আলোচনার মূল থ্রেডটা অবিকল চলছে, হার্ডডিস্কে নামানো সাইটাংশের সঙ্গে হুবহু একই ভাবে। কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে। আলোচনার থ্রেডে ইন্ডাসের এন্ট্রির আগেরটা আছে, পরেরটাও আছে, শুধু ইন্ডাসেরটা নেই। গোটা মেসেজবোর্ডে ইন্ডাসের একটা এন্ট্রিও নেই। স্তম্ভিত হওয়ার তখনো বাকি ছিল ত্রিদিবের। অন্য প্রতিটি এন্ট্রি থেকে ইন্ডাসের আলোচনার প্রসঙ্গগুলো সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে, গোটা গোটা বাক্যগুলো। আর যে দুটো এন্ট্রি থেকে প্রসঙ্গটা কিছুতেই সরানো যায়নি, সেই এন্ট্রি-দুটোই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্তটা করা হয়েছে সযত্নে। মেসেজবোর্ডের প্রতিটি পোস্টের ক্রমিকসংখ্যা মেনে। আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে। ফলত, তার হার্ডডিস্কে রাখা সাইটাংশের আলোচনার গোটা কাঠামোটাই এখানে বদলে গেছে। সাইট-কপিয়ার দিয়ে নামানো না-থাকলে কোনোদিনই যা জানতে পারত না। শুনলেও কি বিশ্বাস করত? কেন, ভাবে ত্রিদিব, এত নির্দোষ একটা আলোচনা? মানে কী এর? কে করল? কেন? ওয়েবমাস্টারকে মেল করল ত্রিদিব। একাধিক। জানতে পারল, ওয়েবসাইটে কোনো ক্র্যাক ঘটেছে যতদূর সম্ভব, তারা এর জন্যে দুঃখিত। একবার এটা আবিষ্কারের পর, যে কটা জায়গা আছে ইন্ডাসের সম্ভাব্য উপস্থিতির, তার জানা এবং হার্ডডিস্কের ফাইলগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে, তার প্রত্যেকটাতে গিয়ে দেখল ত্রিদিব। ইন্ডাস আর কোথাও নেই, সবগুলো সমস্তগুলো থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। কাজটা যেই করুক, যে ভাবেই করুক, সহজ নয় কোনো অর্থেই। নিজের সীমিত কম্পিউটার অভ্যস্ততা দিয়ে এরকম কোনো উপায় ভেবে বার করা তার কল্পনারও বাইরে। কিন্তু এটুকু বোঝা সহজ যে এটা কোনো ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। এমনকি খুব ভালো করে সাইবার প্রকৌশল আয়ত্তে আছে এমন কয়েকজন লোকের পক্ষেও এটা অসম্ভব, যদি না সরকারি ক্ষমতা দেওয়া থাকে তাদের। ইন্ডাসের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিবেদনা যা করতে পারেনি সেটাই এবার ঘটিয়েছিল এই আবিষ্কারটা। গোটা নেট জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইন্ডাসের ছোট ছোট মতামতের এন্ট্রগুলোর মত একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ক্ষমতার এই অসম্ভাব্য অকল্পনীয় ব্যবহারটা তাকে এলোমেলো করে দিয়েছিল, নড়িয়ে দিয়েছিল। নিজের এতদিনকার যুক্তিবোধের সৌধ থেকে তুলে আছড়ে ফেলেছিল অপার শূন্যতায়। যা ঘটতে পারে তার কত কম অংশই সে ভেবে নিতে পারে।

ইন্ডাসের মেলে যা যা ইন্ডাস বলেছিল, তার চেয়েও বেশি করে ত্রিদিবকে এবার ভাবাতে শুরু করেছিল যা যা ইন্ডাস বলেনি, কিন্তু ত্রিদিব পড়ে নিতে পারছিল। যেমন, একবারো ওই 'নিয়ান্ডারথাল' কথাটা না-লেখা, অন্য ইমেল আইডি ব্যবহার করা, ইত্যাদি। ব্যক্তিগত থাকার অধিকার, রাইট টু প্রাইভেসি, এবং এফবিআই তথা নাসা ইত্যাদি সংস্থার তরফে তার উপরে বারবার অনুপ্রবেশ ইত্যাদি নিয়ে কিছু লেখা পড়েছিল নেট থেকে। সেখানকার কিছু প্রসঙ্গ

তার মাথায় ফিরে ফিরে আসছিল। বিশেষত তথ্যের আদানপ্রদানে সাইবার নির্ভরতার নিরিখে। যেই টেলিফোনে কেউ বিশেষ কিছু শব্দের কোনোটা উচ্চারণ করবে, সঙ্গে সঙ্গে তার নামে একটা ফাইল তৈরি হয়ে যাবে, এবং তাকে 'এনিমি অফ দি পিপল' ধরে নিয়ে তার বিষয়ে তদন্ত করা শুরু হয়ে যাবে, এটা যদি বিশুদ্ধ স্কাই-ফি-ও হয়, তথ্যের ইলেকট্রনিক আদানপ্রদানের উপর এ ধরনের একটা ফিল্টার লাগানো তো সত্যিই তেমন শক্ত কিছু নয়। যে কোনো ইমেলে কিছু নির্দিষ্ট অক্ষরমালা থাকলেই তার একটা কপি কোথাও জমা হতে থাকবে। এবং কেউ একটা সেই মেলটাকে, মেলের লেখককে এবং প্রাপককে তখন খুঁটিয়ে নজর রাখতে থাকবে, এটা তো সত্যিই শক্ত কিছু নয়। আরো যে ধরনের সামর্থের পরিচয় সে ইন্ডাসের এন্ট্রিগুলোর সূত্রেই পেয়েছে। সেরকম কিছু যদি সত্যিই কারণ হয়, ইন্ডাসের কিছু বিশেষ শব্দ ব্যবহার না-করার? অন্য আইডি থেকে সতী শব্দের, পলিটিকালি কারেক্ট মেল, যাতে তার জন্যে ত্রিদিবও বিপদে না পড়ে?

ইন্ডাসের থেকে এটুকু পেল ত্রিদিব, এই সম্ভাবনাটুকু, যে এটা সত্যিই হতে পারে যে, কেউ একটা, খুব উচ্চস্তরের ক্ষমতাবান কেউ, কিছু বিশেষ বিষয় নিয়ে কিছু বিশেষ মতামত, এই সেই বিশেষ মতামতের অধিকারীদের প্রহরায় রাখছে এবং নিয়ন্ত্রণ করছে। এটা যে সম্ভব এটুকু বুঝতে পারল ত্রিদিব। এবং আরো বুঝল যে, হোমো সেপিয়েন্স নিয়ান্ডারথালানাসিস এই রকম একটা স্পর্শকাতর বিষয় হতেই পারে। ইন্ডাসের এই মতটাও তার কাছে অসম্ভব লাগেনি যে, ইংকা মায়া সিন্ধু মেসোপটেমিয়া মিশর এগুলো নিয়ান্ডারথাল সভ্যতা হতেই পারে। যদি এমনকি বিশুদ্ধ নিয়ান্ডারথালতা সেটা যদি নাও হয়, সেখানে একটা ব্যাপক হারে নিয়ান্ডারথাল অংশগ্রহণ থাকতেই পারে। আসলে, এই বিশুদ্ধতার ধারণাটার প্রতিই একটা বিরূপতা আছে ত্রিদিবের। হয়ত সে নিজে সামগ্রিক ভাবেই এতটা অবিশুদ্ধ বলে, তার একটা অচেতন ঈর্ষার প্রকাশও হতে পারে এটা। তা যদি হয়ও, সেটা খুব একটা দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে হয়না তার।

এটা ত্রিদিব মনেই করে, বিশুদ্ধতার ধারণা জন্মায় একটা বিশুদ্ধতম মা, বিশুদ্ধ মা-বাবা পাওয়ার বাসনা থেকে। যৌনতা চিনতে শেখার প্রথম দিকে তাই সবচেয়ে বড় ঝাঁকুনিটা হয় নিজের জন্ম, তাই জন্মের পিছনে বাবা-মা-র ক্লিন্নতাটা জানা — যোনিহীন মা লিঙ্গহীন বাবার বিশুদ্ধতাটা আর পাওয়া হয়ে উঠল না। তাই, ত্রিদিবের বোধহয় এটা সৌভাগ্যই যে তার বাবা-মা-মামা এই গোটাটা মিলে মাতৃত্ব পিতৃত্ব ইত্যাদি গোটাটাই অমন মর্মান্তিক ভাবে ঘেঁটে যাওয়া। ওসব বিশুদ্ধতা-বিলাস তার কোনোদিন ঘটেই ওঠেনি। হোমো সেপিয়েন্স হোক বা হোমো সেপিয়েন্স নিয়ান্ডারথালানাসিস, বিশুদ্ধতার ধারণাটাই তার ভালো হজম হয় না আর। বিশুদ্ধ হোমো সেপিয়ান্স বা বিশুদ্ধ হোমো সেপিয়েন্স নিয়ান্ডারথালানাসিস এর কোনোটাকেই ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ত্রিদিব। বিষমানুষদের নিয়ে নিজের খুঁড়ে চলার প্রক্রিয়া থেকেও এর পক্ষে কিছু উপাদান এসেছে, সে কথা আসছে এখুনি। আর বিশুদ্ধতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুক্তি তো ঘটনার আকারে এই রিপোর্টে ইতিমধ্যেই এসেছে। ব্যাংক দারোয়ানের সঙ্গের বারবিলাসিনী ওই নারী, দুই বাচ্চা নিশ্চিত ভাবে আর এক বাচ্চা অনিশ্চিত ভাবে হারিয়ে যে নিরুদ্দেশ এসে ভিড়েছিল মাংসের বাজারে। ব্যক্ত-অব্যক্তের বর্ডারলাইন ওই নারীর বিষলক্ষণ তো খুব বেশি অব্যক্ত ছিল না। তাও মাংসের বাজারে তাকে কাটা হচ্ছিল, হোমো সেপিয়েন্সের বিশুদ্ধতা বিষয়ে এর চেয়ে বড় ফক্কুরি আর কী হয়? তাদের মফস্বল মিউনিসিপালিটির পৌরভবনের খুব কাছে এক পাগলি থাকত, তার ল্যাংটো গা বেয়ে কাদা পড়ত, পোকা। তাতেও নয় দশ মাস অন্তর তার পেট ফুলে যেত প্রেমিক ঔরসে। বাচ্চাগুলো তার পর কী হত - - মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ত্রিদিবের, খেয়ে ফেলত হয়ত। এখন আর দেখে না, বছরে একটা করে বাচ্চা খেয়ে কতদিন আর বাঁচা যায়। পোকা-গড়ানো পাগলিনীর এই হালতের পর, এত হাজার বছরেও হোমো সেপিয়েন্স বিশুদ্ধতার গল্পটা হোমো সেপিয়েন্স বিশুদ্ধতার গল্পটা হোমো সেপিয়েন্স পুরুষের পৌরুষের অক্ষমতার উপর বড্ড বেশি বিশ্বাস বলে মনে হয় ত্রিদিবের। রিপোর্টের টেকনিকাল অংশটায় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, হোমো সেপিয়েন্স এবং হোমো সেপিয়েন্স নিয়ান্ডারথালানাসিস প্রজাতির জিন সংমিশ্রণের সম্ভাবনাটা সেখানে ছিলই। তাই, বিশুদ্ধ হোমো সেপিয়েন্স বা বিশুদ্ধ হোমো সেপিয়েন্স নিয়ান্ডারথালানাসিস কই, কোথায়?

এটুকু জায়গা নিশ্চিত যে বিষমানুষদের বিরুদ্ধে একটা সর্বব্যাপী প্রতিরোধ আছেই। চারদিকে ব্যাপ্ত এই হোমো সেপিয়েন্স সভ্যতার প্রতিটি স্তরে তারা আক্রান্ত, অবরুদ্ধ। এমনকি তাদের তথ্যটুকুও। কাঁচরাপাড়া স্টেশনের চারদিকে ওই ফ্যালা-ন্যাপলা-বটারা কখনো নাসা-এফবিআই-সিআইএ-র হাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়নি, অ্যাকচুয়ালি কোনো শিক্ষাই

কখনো প্রাপ্ত হয়েছে কি তারা, তার প্রয়োজনও পড়েনি। সমাজ সভ্যতা সম্পর্কের আভ্যন্তরীণ এটা। এরা কেউই জানেনা, কার জিনোমের সে অধিকতর প্রতিনিধি, হোমো সেপিয়েন্স না হোমো সেপিয়েন্স নিয়ান্ডারথালানাসিস, কিন্তু সে প্রতিনিধিত্ব করে হোমো সেপিয়েন্সের। আদতে কেউই কি জানে তার জিনের অধিকাংশ কোথা থেকে এসেছে? জানা কি সম্ভব আদৌ? যদি এমন হয়ে থাকে যে হোমো সেপিয়েন্স জিন-পুল বলে যেটা প্রচারিত, সেটার মুখমণ্ডল জাতীয় কিছু বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে গোটাটাই এসেছে নিয়ান্ডারথালানাসিস-এর জিন-পুল থেকে? কে বলতে পারে? বলা কি সম্ভব আদৌ? এরা তো হোমো সেপিয়েন্সের সহোদর ছিল, তাই প্রচুর বৈশিষ্ট্য তো দুই পক্ষেই বর্তাবে। গোটা প্রক্রিয়াটা যদি ক্রেয়নের মত করে ঘটে থাকে — আন্তেগোনের সেই সহোদরকে সে দেশপ্রেমিক করেছিল, দুই ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহের ভিতর যে ছিল কম কুদৃশ্যতর, এবং অন্যজনকে দেশদ্রোহী? সেই একই ভাবে, হোমো সেপিয়েন্স-ই নির্বাচিত হয়েছে পরিচিতি, আইডেন্টিটি হিশেবে, আর, এই নির্বাচন ঘটে যাওয়া মাত্রই, আর কিছু করার থাকেনা, হোমো সেপিয়েন্স নিয়ান্ডারথালানাসিস-কে অবরুদ্ধ নির্বাসিত অপনোদিত না-করে। তাই, বিষমানুষের লক্ষণ ব্যক্ত হওয়া মাত্র, অমৃতমানুষদের তাকে মারতেই হবে। বরং, এখানটায়, নিজের সঙ্গে তুলনা করে, অমৃতমানুষদের বড় দুর্ভাগা লাগে ত্রিদিবের। হত্যাকারী হওয়া ছাড়া আর কোনো ভবিতব্য অবশিষ্ট থাকে না এদের। এমনই এদের আত্মপরিচিতি, হত্যা ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই এদের আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের। তাই, শুধু, ফ্যালা-ন্যাপলা-বটারা নয়, কাঁচরাপাড়া স্টেশনের তৃতীয় বাচ্চাদের হত্যা করতেই হয় সরকারি ডাক্তারদেরও। সরকারি ডাক্তারিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় অবশেষহীন ভাবে অবলুপ্ত হয় এরকম প্রতিটি বাচ্চা। বাচ্চা বা তার তথ্য — এর কোনোটাকেই আর পাওয়া যায়না। প্রতিটি কেসেই এই একই ইতিহাস, বা, ইতিহাসের অভাব, বেশ কিছু উদাহরণ খুঁড়ে দেখেছে ত্রিদিব। অমৃতমানুষদের ইতিহাস থেকে এরা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়, ঠিক সেই উপপ্রজাতির মত যার জিন এরা বহন করছে।

লুপ্ত হয় কিন্তু লুপ্ত হয় কোথায়? লুপ্ত যদি হয়ই তো এই রিপোর্টটা লেখা হয় কী করে? কোনো লুপ্ত ত্রিদিব তো এই রিপোর্টটা লিখতে পারত না? ত্রিদিব বোঝে, এই প্রসঙ্গটা আসা মাত্রই তার মুখের রেখা কোমল হয়ে আসছে। একটা বেদনা, একটা হাত-বাড়িয়ে-বুকে-তুলে-নিতে-চাওয়া। তার শরীর তুলো তুলো হয়ে যায় এটা মনে এলেই। তার ভাল ভাই দুজন নেই, একেবারেই নেই, একটুও নেই - - কিছুতেই মেনে নিতে পারে না ত্রিদিব, কোনো দিনই পারেনি। আর তাই কি রিপোর্টটা লেখে সে? না, এর একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্য তো আছেই। একটা ইতিহাসের সামনে পিছনে উপরে নিচে জাঙ্গিয়ার নিচে গোলাপের পাঁপড়িতে দাঁড়া নেড়ে নেড়ে পিঁপড়ের গানে আরো কত ইতিহাস ব্যক্ত অব্যক্ত রয়ে যায়, তার কোনোটাই যাতে হারিয়ে না যায়। জরথুষ্ট্র, বুদ্ধ, যীশু, গান্ধী ইত্যাদি যারা মানুষের, হোমো সেপিয়েন্স এবং হোমো সেপিয়েন্স নিয়ান্ডারথালানাসিস দুইই, বা দুয়ে মিলে মিশে একটা মিশ্র জিনোম, যাই হোক, কষ্টটা পেতেন নিজের কষ্টের চেয়ে অনেক বেশি করে, তাদেরই কে একজন বলেছিলেন না, শত ফুল বিকশিত হোক?